বিএনপি'র একশ দিনের সাফল্য ব্যর্থতা

সন্ত্রাসের দায়ে গ্রেপ্তার দলীয় সংসদ সদস্য পিন্টু

বেড়েছে দ্রব্য মূল্যের দাম

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোট নিরংকুশ আসনে বিজয়ী হওয়ায় সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বেড়েছে। সরকার ইতিমধ্যে ক্ষমতায় আরোহণের একশ দিন অতিবাহিত করেছে। জনগণের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা। এই শত দিনের সরকারের কার্যক্রমে যেমন রয়েছে সফলতার দিক, তেমনি ব্যর্থতার বিশাল খতিয়ান। সরকারের একশ দিনের কার্যক্রম নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষে বিশ্লেষণ করেছেন অনিরুদ্ধ ইসলাম ও জয়ন্ত আচার্য

অক্সফোর্ড ডিকশনারি 'হানিমুন' শব্দার্থ লিখেছেন এভাবে– *'a period of enthusiastic GOODWILL at the Start of an activity.'* ।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের বিশাল বিজয় জনমনের উৎসাহব্যঞ্জক প্রত্যাশারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। যাত্রা শুরুর ব্যাপারে উচ্ছ্বাসপূর্ণ শুভকামনার ছোঁয়া থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। এ কারণে ক্ষমতা গ্রহণ করে বেগম জিয়া জাতির উদ্দেশে তারিখ যাবে যে ভাষণ দেন তাতে বিধৃত কর্মসূচি জনগণের কাছে এই অচল অবস্থা পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া তার নতুন সরকারের প্রথম কাজগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে একশ' দিনের যে সময়সূচির কথা বলেন তাতে অনেকেই নির্বাচনের পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নতুন সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে উপদেশবাণী স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ তার এক লেখায় উল্লেখ করেন যে এই দুইয়ের মিল দেখে তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে ঐ একশ' দিনের কর্মসূচির কথাটা নিয়েছেন। কর্মসূচিটি সাজিয়েছেন নিজের মত করেই।

নির্বাচনোত্তর সারা দেশে বেড়ে যায় সহিংস ঘটনা। চাঁদাবাজির পরিমাণ। সরকার সমর্থক দাবিদার সন্ত্রাসীদের টেন্ডারবাজি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে লালবাগের সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর এ ধরনের নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আসতে থাকে। অবশেষে বেঙ্গল লেদার ইন্ডাস্ট্রিজে টেন্ডারবাজির জন্য ২৬ ডিসেম্বর গোয়েন্দা পুলিশ পিন্টুকে গ্রেপ্তার করে। দলীয় সংসদ সদস্য পিন্টুকে গ্রেপ্তার জোট সরকারের সন্ত্রাস দমনের সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ।

ঋণ খেলাপি প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্ব দিয়ে গত বছর তীব্র বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। জুন মাসেও সব বই পৌঁছেনি শিক্ষার্থীদের হাতে। এ বছর দক্ষতার সঙ্গে সরকার পাঠ্যপুস্তক সমস্যার সমাধান করেছে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে

দেশের প্রত্যন্ত জনপদের স্কুলগুলোতে বই পৌঁছে যাচ্ছে।

দেশের সহিংস ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য ব্যারিস্টার ওমর সাদাতের রিট আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও বিগত সরকার উদ্যোগ নেয়নি। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষাঙ্গনে শুরু হয় হল দখলের পালাবদল। সশস্ত্র মহড়া। বিতাড়িত ছাত্রলীগের কর্মীরা জগন্নাথ হল দখলের চেষ্টা করতে গেলে সশস্ত্র ছাত্রদল কর্মীরা তাদের তাড়া করে। এ দৃশ্য পত্রিকায় প্রকাশের পরেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব করেন।

জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই পলিথিনমুক্ত ঢাকা মহানগীর ঘোষণা দেন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাজাহান সিরাজ ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা মহানগরীতে পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করেন। পরিবেশবাদীরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা মহানগরীর জনগণ পলিথিন ব্যাগ বর্জন করে। রাজধানী এখন দানব পলিথিনমুক্ত।

জাতির উদ্দেশে দেয়া শত দিনের কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর যানজট কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঢাকা মহানগরীতে ১ জানুয়ারি থেকে বিশ বছরের অধিক ব্যবহৃত যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। এ কারণে পুরনো ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন রাস্তায় কমে যায়। কমে আসে যানজট।

সরকার হঠাৎ করেই ১ জানুয়ারি থেকে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম। এ কারণে দূরপাল্লার বাসের ভাড়া বেড়ে যায়। বৃদ্ধি পায় নিত্যপ্রয়াজনীয় দ্রব্যের দাম। এতে মধ্যবিত্তের মাসিক খরচ হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। জ্বালানি দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের ওপর সাধারণ জনগণ ক্ষুব্ধ। বিরোধী শিবির মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কার্যত কোনো কর্মসূচি দিতে পারেনি।

১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানি চলতে থাকে। নির্বাচন- পরবর্তী ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর সহিংসতা বেড়ে যায়। সহিংস ঘটনায় ৪০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক প্রাণ হারায়। ধর্ষিত হয় অনেক মেয়ে। নয়া সরকার সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যত ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার অভিযোগে মূলত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর এ ধরনের নির্যাতন হয়।

বিরোধী দলের আন্দোলন দমনে মরিয়া সরকার

অথচ নির্বাচন-পরবর্তী হয়রানির সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে ভয়ে নিজেরাই এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল শুরু করে। জনতার মঞ্চের একশ' কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত অথবা বিগত সরকার সমর্থক সন্দেহে সারা দেশের প্রশাসনে চলছে বদলি ও রদবদল। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা জনতার মঞ্চে ওঠে ও প্রকাশ্যে আওয়ামী সরকারের পক্ষে কাজ করে অনৈতিকতা করেছে। এর দায় হিসেবে প্রশাসন গণঅবসর ও বদলি গ্রহণযোগ্য নয়। বাধ্যতামূলক বদলি ও অবসরদানে প্রশাসনে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। বাড়ছে ক্ষোভ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা বাংলাদেশে ফুটবলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকাকালীন বাংলাদেশ আগামীতে কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবলে অংশ নিতে পারবে না। সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি এডহক কমিটি গঠন করে। এ অনিয়মের কারণে ফিফা কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশের ফুটবল অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বিকল্প ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ সরকার ১ জানুয়ারি থেকে রাজধানীতে বিশ বছরের অধিক ব্যবহৃত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে জনগণকে পড়তে হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগে। বিআরটিসি পরিবহন সমস্যার জন্য নতুন বাস নামিয়েছে। তবে এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ কারণে যানজট কমলেও পরিবহনের অভাবে জনগণের দুর্ভোগ বেড়েছে।

কসমেটিক পরিবর্তন

দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই একশ' দিনের কর্মসূচি ঘোষণায় দেশের বিরাজিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানের সূচনা দেখতে চেয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির ভাব-ভাষা অনেকটাই ছিল কসমেটিক, উপরভাসা। প্রধানমন্ত্রী স্পিচ রাইটাররা তাকে একজন আধুনিকমনস্ক অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ হিসাবে তুলে ধরতে গিয়ে ঐ কর্মসূচিতে যে সমস্ত কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাতে আওয়ামী দুঃ শাসনের পাঁচ বছরে সংকটে জর্জরিত দেশের মানুষ খুব একটা পরিবর্তনের কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু আশা করেছিল সন্ত্রাস দমনের। অনেক ক্ষেত্রে লঘু চিন্তারই প্রকাশ দেখেছে। যেমন : ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরির গিমিক।

বাংলাদেশে যেখানে সাক্ষরতাই এখনো সমস্যা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা চরম বিপর্যয়ের মুখে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর একশ' দিনের কর্মসূচিতে ছয়টি বিভাগীয় শহরে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। দেশের তরুণীরা এইসব ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরিতে চায়নিজ, জাপানিজ, ফরাসি, আরবি, জার্মান ও ইংরেজি শিখে বিদেশের জন্য নিজেদের কর্মোপযোগী করবে। অথচ বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা এতই কঠোর যে বেগম জিয়ার জনশক্তি মন্ত্রীকে বিদেশে ছুটতে হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক মন্দাক্রান্ত সেসব দেশ থেকে বাংলাদেশের কর্মরত শ্রমিক-কর্মজীবী মানুষের ফিরে আসতে না হয়। কারণ ইতিমধ্যে বিদেশে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মচ্যুতির পরিণামে

যানজট ঢাকাবাসীর নিত্যসঙ্গী। ঢাকায় যানজট কমাতে সরকার নিষিদ্ধ করেছে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল। রাস্তায় নামানো হচ্ছে অধিক সংখ্যায় বিআরটিসির বাস। দৃশ্যত যানজট এখন কিছুটা কমেছে

দেশের রেমিটেন্স কমে গিয়েছিল। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে টান ছিল প্রচণ্ড। সেখানে এ বক্তব্যটা আধুনিক এবং লম্বা সময়ের কার্যক্রম হলেও ১০০ দিনের হিসাবে মেলে না।

তবে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের কথা একশ' দিনের কর্মসূচিতে উল্লেখ না থাকলেও বিএনপি সরকার বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। আর সেই প্রত্যাশা হল প্রবাসী মন্ত্রণালয়। এটা ১০০ দিনের নয়, বিএনপি'র নির্বাচনী ওয়াদাই ছিল। এই মন্ত্রণালয় গঠনের মধ্য দিয়ে বিদেশে কর্মরত এদেশের মানুষরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে বিনিয়োগ, বিদেশে থাকতে তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সম্পর্কে এখন নিশ্চিন্ত হতে না পারলেও, কোথাও কথা বলার সুযোগ পাবে।

শিক্ষাঙ্গনে দখলবাজি

বেগম জিয়া তার একশ' দিনের কর্মসূচিতে 'সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ও সেখানে সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একতরফা দলীয় আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সত্য মেনে নিয়েই বলতে হবে শিক্ষাঙ্গনে স্থিতাবস্থা কিছুটা ফিরে এসেছিল। প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দেয়ার ফলে ঐ পাঁচ বছরে শিক্ষাঙ্গনে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটেনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পরপরই শিক্ষাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ নেয় বিএনপি'র ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্দখলের পাঁয়তারায় ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু করাই সম্ভব হয়নি। জনগণ মনে করছে শিবিরকে বিএনপি নিয়ন্ত্রণে আনছে না।

নির্বাচনে বিএনপি জোট সরকার বিজয় লাভ করার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দখল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। ভিন্ন মতে বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগ রাতারাতি কেটে পড়ে। এবং তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য বিএনপি ছাত্রদল নেতা নাসিরুদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্যাডাররা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে জগন্নাথ হল, জহরুল হক হলের দখল নিয়েছে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে রাজি হয়নি। মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা আরও ভয়ানক। বরিশাল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রদল নেতা পরীক্ষার হলে নকল নিশ্চিত করেছে। কেবল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই নয়, বিএনপি ছাত্রদল নেতা পিন্টুর নেতৃত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও দখল চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনের নাটকের দ্বিতীয় পর্ব ছিল উপাচার্য বদল প্রক্রিয়া। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে না কুলোবার ফলে বেগম জিয়ার সরকার উপাচার্য বদলের ব্রিটিশ আমলের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্টের আশ্রয় নিয়েছে। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে জোট সরকারের নিয়োগকৃত এই উপাচার্যরা ঐ চেয়ারের দখল নিতে রাত পোহানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস চব্বিশ ঘণ্টার, এই কথা বলে রাতেই উপাচার্যের দপ্তরের তালা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করেছেন। সংবাদপত্রে হর্ষোৎফুল্ল এই উপাচার্যদের ছবি দেখে দেশের মানুষ শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কে একশ' দিনের কর্মসূচির যে সার কথা বুঝেছেন তা হল শিক্ষাঙ্গনকে তার নিজ পরিচয়ে ফিরিয়ে দেয়া নয়, দখলে নেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আর এই দখলি প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা থাকলেও সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নেই।

'চটি জুতার ফিতা'

বাংলায় 'চটি জুতার ফিতা' বলে একটা ব্যঙ্গ আছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চটি জুতা সদৃশ হালঅবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একশ' দিনে দেশের তরুণীদের কম্পিউটার, ইংরেজি শিক্ষা, এমনকি মোটর গাড়ি চালনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

দেশের কম্পিউটার শিক্ষা কার্যত কোনো সরকারি উদ্যোগের বাইরেই গড়ে উঠেছে। বরং কোনো রেগুলেটরি ব্যবস্থা না থাকায় বিদেশী কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা

প্রতিষ্ঠার অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করলেও কম্পিউটারের কার্যকর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকের নেই বললেই চলে। আর বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় আইটি খাতও বিপর্যয়ের মুখে।

তারপরও বাংলাদেশকে দ্রুত কম্পিউটার জগতে নিয়ে যাবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর একশ' দিনের কর্মসূচি ঘোষণায় একটা সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছিল। ইতিমধ্যে ঐ ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকায় কম্পিউটার বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে। কিন্তু গোড়ায় যেখানে গলদ থেকে যায় সেখানে যে সামনে এগুনো যায় না সেটা বোঝার ও বোঝাবার শক্তি যেন আমাদের ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তবুদ্ধির চর্চা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও রয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে সামনের কাতারে। অথচ এই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই চলছে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদগামীদের খেলা। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবিরের চাপ থেকে বের করলো কম্পিউটার শিক্ষায় সরকারের সদ্দিচ্ছা স্পষ্ট হবে। এখন এখানে কম্পিউটার জ্ঞান দূরে থাক, অগ্রবর্তী চিন্তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অচল হয়ে যাচ্ছে এই বাংলাদেশে।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন একশ' দিনের ঐ কর্মসূচিতে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজিকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি এর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ঐ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি উদ্যোগ নিয়েছে অথবা কোনোই উদ্যোগ নিয়েছে কিনা সেটা জানা যায়নি।

আর দেশের প্রতিটি জেলা শহরে মোটর ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রথম একশ' দিনে কি কাজ পড়েছিল সেটা জানা নেই। দেশের বেকার যুবকরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মোটর ড্রাইভিং কেন, এ ধরনের যেকোনো সুযোগ পান তাই শিখে নিয়ে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মোটর ড্রাইভিং শেখা ন্যাশনাল প্রায়োরিটিতে কিভাবে এল সেটা বোঝা মুশকিল। প্রধানমন্ত্রী কি জানেন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ট্রেনিং ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়। সরকারকে ট্রেনিং দিতে হবে না। লাইসেন্স ব্যবস্থাটিকে সহজ ও আইন সঙ্গত করলেই দেশ অনেক এগুবে।

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষাঙ্গনে শুরু হয় হল দখলের পালাবদল। সশস্ত্র মহড়া। বিতাড়িত ছাত্রলীগের কর্মীরা জগন্নাথ হল দখলের চেষ্টা করতে গেলে সশস্ত্র ছাত্রদল কর্মীরা তাদের তাড়া করে। এ দৃশ্য পত্রিকায় প্রকাশের পরেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন

জল-স্থল পথে মৃত্যু ও দুর্ঘটনা

দেশের জলপথ ও স্থলপথে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য অ্যাডভান্সড ড্রাইভার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণের জন্য রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তার একশ' দিনের কর্মসূচিতে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে দেশকে দুর্ঘটনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কথা রেখেছেন। গত ঈদের সময় নদীপথে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য কোনো 'রিসার্চ' ইনস্টিটিউটের শরণাপন্ন তাকে হতে হয়নি। কেবলমাত্র সদরঘাটে গিয়ে মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সাথে আলোচনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী কর্তৃক আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করে তিনি ঈদে জলপথে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সব আইন ও তার প্রয়োগের ফাঁক থেকেই যায়। আর সেই কার্যকারণে যদি দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সম্পর্কের স্বার্থ থাকে, তখন আরও বিশেষভাবে ঐ ফাঁক গলে সব বেআইনি কাজ হয়।

তবে স্থল ও জনপথকে দুর্ঘটনার অভিশাপমুক্ত করার প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্যই বোধহয় এই সময়ে বগুড়া ও আরিচা সড়কে দু'টি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে বিপুল সংখ্যক মানুষের। অবস্থাটা এমনই যে যোগাযোগমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে 'এ আর চলতে পারে না।' কিন্তু এ ঘটনা ঘটেই চলেছে। সংবাদপত্রগুলো বলছে যে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও লাইসেন্সবিহীন চালকরা এসব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। একশ' দিনের মধ্যে সরকারের আদেশে ঢাকা মহানগরের রাস্তা থেকে বিশ বছরের পুরনো বাস, ট্রাক তুলে দেয়া হয়েছে। মহানগরে চলাচলের জন্য সেগুলোর রুট পারমিট বাতিল করা হয়েছে। এটি একটি বড় উদ্যোগ। এর ফলাফল অবশ্যিই পাওয়া যাবে।

তবে লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সেই পুরাতন অরাজকতা নানা ভাবেই বিদ্যমান। সোজা পথে, নিয়মমাফিক কেউ লাইসেন্স পায় না। সবাইকে বাধ্য হয়ে দুই নম্বর লাইসেন্স করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী যদি 'অ্যাডভান্সড ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার আগে 'ওয়ান স্টপ লাইসেন্স' প্রদানের মাধ্যমে গাড়ি চালকদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করার জন্য তার একশ' দিনের প্রয়াস নিয়োগ করতেন তা হলে হয়তো কিছু ফলাফল পাওয়া যেত।

পরিবেশ বিষয়ক চিন্তা

প্রধানমন্ত্রীর একশ' দিনের কর্মসূচিতে আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের বিষয় স্থান পাওয়ায় তিনি ধন্যবাদার্হ। বাংলাদেশের তেরো কোটি মানুষের আট কোটি মানুষই আর্সেনিক দূষণ প্রক্রিয়ার ঝুঁকির মুখে। তিন কোটি মানুষ ঐ সমস্যায় ইতিমধ্যে আক্রান্ত। আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলা করা জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রথম বিষয় হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এই সমস্যাকে এখনও পর্যন্ত দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও কার্যক্রম নির্ভর বিষয় করে রাখা হয়েছে। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উদ্যোগের

দানব পলিথিনকে রাজধানীতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

পাশাপাশি জনসচেতনতা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই জরুরি কাজ। প্রধানমন্ত্রী তার একশ' দিনের কর্মসূচিতে সেখানে এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেই সেমিনার অনুষ্ঠিতও হচ্ছে। এই সেমিনার সংস্কৃতির বাইরে আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলায় কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তার কোনো দিক নির্দেশ যেমন নেই, একশ' দিনে ঐ সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে সে ব্যাপারেও বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে জনসমর্থন পেয়েছে পলিথিন ব্যাগ নিয়ন্ত্রণে আনা। এটিতে মানুষ মহাউৎসাহে সাড়া দিয়েছে। চার দিকে ছোট ছোট জুট ব্যাগের কারখানা তৈরি হয়ে গেছে কয়েক দিনের মধ্যে। পুরনো গাড়ি শহর থেকে সরিয়ে ফেলার যাতায়াতে সাময়িক অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কমেছে যানজট এবং বিষাক্ত ধোয়া।

পুঁজির বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনা

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল শেয়ার বাজারে কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে। শেয়ার বাজারের এই রমরমা অবস্থা দেখিয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতির কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। কিন্তু শেয়ার বাজারের ঐ কৃত্রিম উল্লম্ফনের পেছনে যে চক্রান্ত কাজ করছিল সেটা তিনি দেখাতে রাজি ছিলেন না। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের সমস্ত সঞ্চয় যখন ঐ শেয়ার বাজারে ঢুকে গেছে তখনই পতন ঘটানো হয়েছে বাজারের। ক্ষমতায় এসেই তারা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত গৃহবধূর জমানো টাকাও লোপাট করে। কয়েকদিনের মধ্যেই উচ্চমূল্যের শেয়ার সার্টিফিকেট পরিণত হয়েছে নিছক কাগজে। ইতিমধ্যে শেয়ার কেলেঙ্কারির নায়করা হাতিয়ে নিয়েছে ৬০০ কোটি টাকার ওপর। এই শেয়ার কেলেঙ্কারির নায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল বেক্সিমকোর সোহেল-সালমানরা, দোহা সিকিউরিটিজ, বিদেশী কোম্পানি পোউগ্রিনের রুমানা আলম। কিন্তু সর্বস্ব হারানো মধ্যবিত্তের কান্নায় বাংলাদেশের বাতাস ভারী হয়ে উঠলেও ঐ শেয়ার কেলেঙ্কারি নায়কদের কোনো বিচার হয়নি। শাসক আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে হাসতে হাসতে তারা আদালত থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মজার কথা হচ্ছে বিএনপি'র বিরোধী দলের আন্দোলনেও ঐ শেয়ার কেলেঙ্কারি বিশেষ কোনো মনোযোগ পায়নি।

সম্ভবত সেই দোষ স্খলন করতেই প্রধানমন্ত্রীর একশ' দিনের কর্মসূচিতে শেয়ার কেলেঙ্কারির বিচারের বিষয় স্থান পেয়েছিল। সোহেল-সালমানদের চাপে রাখাও ছিল উদ্দেশ্যে। কারণ আওয়ামী লীগের বিত্তবানদের নিজ দলে ভেড়াতে পারলেও সোহেল-সালমানরা এখনও শেখ হাসিনার সঙ্গে। সালমান তো আওয়ামী লীগের প্রার্থীই হয়েছিলেন। কিন্তু শেয়ার কেলেঙ্কারি মামলার ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি অথবা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কোনো কার্যক্রম নেয়া হয়েছে বলে অন্তত সংবাদপত্রের পাতায় কোনো খবর নেই। আর পুঁজির বাজারের হাল অবস্থা পূর্ববৎ। এখনও পর্যন্ত বিশেষ আস্থা ফিরে আসেনি পুঁজি বাজারে। বলা হচ্ছে, সাইফুর রহমান আওয়ামী ধ্বংসস্তূপ পরিস্কার করতেই ব্যস্ত।

এদিকে ১০০ দিন পার হয়ে গেল।

গার্মেন্টস শিল্পের বিপর্যয় রোধ

গার্মেন্টস কোটা বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ নিয়ে বিএনপির এসব পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেন দরবার করতে গিয়েছিলেন। বিএনপি থেকে বলা হয় আওয়ামী লীগ এ নিয়ে এর আগে কোনো রকম লবিং করেনি। যার জন্য অন্যদেশ মার্কিনীদের সুযোগ-সুবিধা পেলেও বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে। এখন বিএনপির তরফ থেকে কোটার বিনিময়ে গ্যাস রপ্তানি করা হবে এ ধরনের একটা আবহ তৈরি করার চেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির বাস্তব বড় নির্মম। মার্কিনিরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে তাদের টেক্সটাইল শিল্পের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে তৈরি পোশাক শিল্পের কোটা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। গ্যাসের লোভ দেখিয়েও প্রেসিডেন্ট বুশের সংরক্ষণবাদের দেয়াল ভাঙা যায়নি। দেশের মানুষ অবশ্য বিদেশে গ্যাস রপ্তানি করার 'কোটার বদলে গ্যাস'— এই চালাকি নীতি ভালোভাবে নেয়নি।

ইতিমধ্যে দেশের প্রায় ১৫০০ গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার হয়ে পড়েছে প্রায় দু'লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক।

মূল এজেন্ডা : সন্ত্রাস, আইন শৃঙ্খলা, দুর্নীতি

একশ' দিনের এসব কসমেটিক কর্মসূচি জনগণের চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তারা চেয়েছে সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও দলীয়করণের ক্ষেত্রে নতুন সরকার তার যাত্রা শুরুর কার্যক্রমে কি ব্যবস্থা নিয়েছে। অক্টোবর নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এবং এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর এবারের বছরের আলোচিত চরিত্র 'সন্ত্রাসী'। গেল বছরগুলোতে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ই ছিল না, জনগণ তার হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনগণের প্রধান অভিযোগ ছিল সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। সন্ত্রাসী গডফাদার জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মায়া চৌধুরীদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এই সন্ত্রাসের অভিযোগেই। জনগণ তাই খুব সঙ্গতভাবেই আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রীর যাত্রারম্ভের কর্মসূচিতে সন্ত্রাস দমনের বিষয়ই প্রাধান্য পাবে আর পেয়েছেও তাই। চারদলীয় জোটকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি ধন্যবাদ দিবস পালনের পরই স্থান পেয়েছে 'অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার ও তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা'র কর্মসূচি।

কিন্তু বিএনপি জোট সরকারের এই কর্মসূচি ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সহিংস ঘটনাবলীর কারণে। আর এই নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কেন্দ্রে ছিল সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। এটাকে অনেকে সাম্প্রদায়িক না বলে শুধু নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ বলে চালাতে চাইলেও এমেনেভিট ইন্টারন্যাশনাল বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দিয়েছে এবং সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ক. অক্টোবর নির্বাচন পরবর্তীতে সারা দেশেই সন্ত্রাসীরা বিএনপি জোটের পক্ষ থেকে আওয়ামী আওয়ামী নেতাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন তাদের লুটের সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। বাকিরা এলাকায় যান না। যান মূলত নতুন সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে।

বিএনপি সরকার যদি বিরোধীদের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসাপরায়ণতার এই নজির সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের জন্য খারাপ হবে। অবশ্য বিএনপি'র দাবি, আওয়ামী লীগ যে পরিমাণে তাদের ওপর অত্যাচার করেছে তারা তার কিছু পরিমাণও করেনি। কিন্তু এবারের নির্বাচনের ম্যানডেট ছিল সহিংসতার বিরুদ্ধে। এটা বিএনপির কর্মিরা মনে রাখছে না। সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে বিএনপি দলেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের সন্ত্রাসী কর্মীদের ওপর। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর এ ধরনের বড় ঘটনা ঘটেছে আড়াই হাজার ও ফেনীর গ্রামাঞ্চলে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আড়াই হাজারের একটি গ্রাম পরিপূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে।

খ. সারা দেশে চাঁদাবাজি ও দখলদারির বিস্তার অব্যহত রয়েছে। নির্মাণকাজ, শিল্প-ব্যবসা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বাস-লঞ্চ টার্মিনাল এই চাঁদাবাজি-দখলদারির সাধারণ টার্গেট তো রয়েছেই, রাস্তার টং দোকান, ফেরিওয়ালা, গণশৌচাগারও এই চাঁদাবাজি-দখলদারির বাইরে নেই। দলে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিএনপি জোটের বিভিন্ন গ্রুপকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে সবাইকে। কোথাও কোথাও যত পরিমাণ অঙ্কের কাজ, তারচেয়ে বড় অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে।

গ. নির্বাচন কালে ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ হয়েছে ব্যাপকভাবে। ধর্ষণের ক্রমবৃদ্ধির ঘটনাকে অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বলে অস্বীকার করেছেন যে, কেউ ঐ ধর্ষণের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে কিনা। এই ধর্ষণের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে সংখ্যালঘু নারীদের ওপর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে কারণেই একে অস্বীকার করতে চেয়েছেন।

তবে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে প্রতিদিন যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে তাতে বিচলিত হয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসিড নিক্ষেপের বিচার 'বিশেষ ট্রাইব্যুনালে' করার ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন। বেগম জিয়ার একশ' দিনের শাসনে দেশের মেয়েরা এসিড অভিশাপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো সংবাদ পেলো।

ঘ. জনগণ অবশ্য এখন আর পুলিশের ওপর বিশ্বাস রাখছে না, সরকারের কথাও বিশ্বাস করছে না। কোনো কোনো অঞ্চলে জনগণ এখন নিজেরাই আইন তুলে নিচ্ছে নিজেদের কাঁধে। চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ও ডাকাতদের গণপিটুনি দিয়ে চিরকালের জন্য দমন করার ব্যবস্থা করছে। গণপিটুনি কোনো সভ্য এবং আইনি ব্যবস্থা নয়। এই গণপিটুনিতে বরং নিরীহ মানুষের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। এটি যেখানে নিয়মতান্ত্রিক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সেখানে সঠিক ফল পাওয়া যায়। একে গণপ্রতিরোধ বলেও অনেকে চিহ্নিত করেছে। পাড়ায়, মহল্লায়, শহর ও গ্রামে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা নাগরিক কমিটি গঠনেও মাধ্যমে অগ্রসর হলেই এর ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে।

বিরোধী আওয়ামী লীগ অবশ্য পিন্টুর এই গ্রেপ্তারকে আইওয়াশ বলছে। আওয়ামী লীগ তাদের আমলে কিন্তু এই আইওয়াশেরও ব্যবস্থা নেয়নি। বরং শেখ হাসিনা খোদ নিজেই জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, দীপু চৌধুরীর সন্ত্রাসী ঘটনার সমর্থনে কথা বলেছেন

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : পিন্টু গ্রেপ্তার

বিএনপি জোট সরকার অবশ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কিছু পরিচয় দিয়েছে এই সময়ে। মন্ত্রীর ভাই ও সাংসদ পুত্রদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বেগম জিয়া প্রথমেই সন্ত্রাসের ব্যাপারে তার আপোসহীন মনোভাবের কথা জানিয়ে দেন। সবশেষে তার সবচেয়ে কাছের লোক বিএনপি ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দীন পিন্টুকে গ্রেপ্তার করার সবুজ সংকেত দিয়ে তিনি আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা সন্ত্রাস করে রেহাই পাবে না।

বিরোধী আওয়ামী লীগ অবশ্য পিন্টুর এই গ্রেপ্তারকে আইওয়াশ বলছে। আওয়ামী লীগ তাদের আমলে কিন্তু এই আইওয়াশেরও ব্যবস্থা নেয়নি। বরং শেখ হাসিনা খোদ নিজেই জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, দীপু চৌধুরীর সন্ত্রাসী ঘটনার সমর্থনে কথা বলেছেন। সেখানে খালেদা জিয়ার বক্তব্য সন্ত্রাস করলে কাউকে ছাড়া হবে না।

এদিকে মন্ত্রিসভার আইন-শৃঙ্খলা কমিটি তালিকাভুক্ত তেইশজন টপ সন্ত্রাসীকে যেকোনো মূল্যে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছে। সেভেন স্টার, ফাইভ স্টারসহ কুখ্যাত এই সন্ত্রাসীরা দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তেইশ জনের ছয়জন বাদে বাকিরা সব বিএনপি সমর্থিত। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এই কার্যক্রম কার্যকর হলে দেশের মানুষ আশ্বস্ত হবে এবং বিএনপি জোট সরকারের ভাবমূর্তিও উন্নত হবে। তবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণায় সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের বাইরে রাখলে চলবে না। তাদেরও এই অপরাধ দমনের আওতায় আনতে হবে। পিন্টুর গ্রেপ্তারের পর বিএনপির একটি অঙ্গ সংগঠন দেয়াল লিপি লিখেছে : 'দলের চেয়ে দেশ বড়।'

শুধু অঙ্গ সংগঠন নয় দেশবাসীর সমর্থনও বেগম জিয়া পাবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর একশ' দিনের কর্মসূচিতে গত পাঁচ বছরে যারা সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে তাদের জড়ো করে ঢাকায় সন্ত্রাস বিরোধী ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য যে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সেটা ঐ ঘোষণাতেই স্পষ্ট। তবে এসবের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শাসক দলসমূহের যেটুকু কমিটমেন্ট পাওয়া যায় সেটাই বড় কথা। বিরোধী আওয়ামী লীগও এই সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই 'মানবতা বিরোধী অপরাধ' সম্পর্কে কনভেনশন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পাল্টাপাল্টি ঘটনায় সন্ত্রাসের মূল ইস্যু বাদ আনা যায়!

প্রশাসনের দল বদল

আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল প্রশাসনে উলঙ্গ দলীয়করণ। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে পূর্বের সব অন্যায় আদেশ বাতিল করার কথা উল্লেখ করেছিলেন তার একশ' দিনের কর্মসূচিতে। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা দেখছে : এক অন্যায়ের বদলে চলছে আরেক অন্যায়। গণবদলি, ওএসডিকরণ, চুক্তি বাতিল, পদোন্নতি স্থগিত রাখা– এসবই এখনও অব্যাহতভাবে চলছে প্রশাসনে। এ ক্ষেত্রে প্রধান টার্গেট '৭২-'৭৩-এর প্রশাসন ক্যাডার এবং

'৯৬ সালের জনতার মঞ্চের নেতারা। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, বিএনপি জোট সরকারে জামায়াত ও ইসলামপন্থিরা সেভাবে শক্ত নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রদবদলের মধ্য দিয়ে তারা সেই লক্ষ্যে তাদের বিশেষ কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। [অন্য নিবন্ধ দ্রষ্টব্য]

নিয়তির পরিহাস : জননিরাপত্তা আইন

আলোচিত বোমা বিস্ফোরণের মামলাসমূহ বিচারবিভাগীয় তদন্ত, রাজনৈতিক মামলাসমূহ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এমনকি জননিরাপত্তা আইন বাতিলের বিষয়ে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংসদের সামনের অধিবেশনে বিল আসবে। বিশেষ নিরাপত্তা আইন বাতিল করার বিষয়ে সরকার এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে। নিয়তি দেখছে যে আইনের বিরুদ্ধে বিএনপি এত বক্তব্য ছিল তারা এখন কি করে।

এসব নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করার ব্যবস্থা নিলেও বিএনপি জোট সরকার ঐ আইনের প্রয়োগ করে চলেছে সমানে। প্রথম বামফ্রন্টের ডাকা দুর্বল হরতালে ও জননিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ করা হয়। আর ঐ জননিরাপত্তা আইনে মামলা দেয়া হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে। ভাবটা এমন যে, 'তোমরা যে আইন করেছিলে তার মজাটা বুঝে নাও।' কথাটা মাননীয় বিচারপতিই স্মরণ করিয়ে দেন।

কিন্তু কালো আইন কালো আইনই। বাতিল না হওয়া সে পর্যন্ত ঐ আইনের প্রয়োগ আসলে ঐ কালো আইনকেই সমর্থন করা।

নিয়তির অবধারিত রূপ : বিএনপি জোট সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দিয়েছে। এক্ষেত্রেও যে পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে সেটা বলে দেয়া যায়। হবে দরদাম। অর্থাৎ অতীতের মতোই এসব দুর্নীতি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে না। যারা অভিযুক্ত হয়েছেন তারা ক্ষমতায় এসেই নিজেদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা স্থগিত করবেন, যেমন করেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি আগের মতোই বহাল থাকবে আর কত দিন?

বিজয়ের ত্রিশ বছর, ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর

মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী পার হয়ে যাওয়ার পরও শেখ হাসিনা তাকে টেনে লম্বা করে ঐ রজতজয়ন্তীর উৎসব করেছিলেন বিশাল সমারোহে মুক্তিযুদ্ধের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও বিজয়ের ত্রিশ বছর পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তার একশ' দিনের কর্মসূচিতে। কিন্তু বিজয়ের ত্রিশ বছর কেবল নীরবে নিভৃতেই চলে গেছে তাই নয়, এবার আবার নতুন করে এই বিজয় দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। ইনকিলাবে প্রবন্ধ লিখে বলা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর নয়, ১৪ আগস্ট আমাদের জাতীয় দিবস। বিজয় দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সাভার স্মৃতিসৌধে জামায়াতের মন্ত্রীরা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভাষণ ছিল না বেতার-টেলিভিশনে। বরং ছিল ইতিহাসের চরম বিকৃতি।

আর ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির কোনো আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। বরং বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাঙালির নববর্ষ উৎসব নতুন করে আক্রমণের মুখে। ঈদের জামাতে বায়তুল মোকাররমের খতিব মহা উদ্দীপনায় আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করেছে প্রেসিডেন্টের সামনে!

বেগম জিয়ার জোট সরকারের একশ' দিনের কার্যক্রমে কালিমা লেপে দিয়েছে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কলঙ্ক। ঐ ঘটনাবলীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে জোট সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এসব ঘটনা অস্বীকার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দিয়েছে। এর অন্যতম শিকার সাহিত্যিক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির।

এসবের মাঝে দেশের মানুষ অশনি সংকেত দেখছে। মানুষের ব্যয় ক্ষমতায় কেবল বিএনপি নয়, জামায়াতও রয়েছে। তারা শরিক হলেও সংগঠন শক্তিতে বলীয়ান। আর বিএনপিতেই তাদের রাজনীতির সপক্ষে লোক প্রচুর। সুতরাং বাংলাদেশের গণেশ উল্টাতে কোনো ষড়যন্ত্র করতে তাদের বাধবে না।

নির্বাচন- পরবর্তী ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর সহিংসতা বেড়ে যায়। সহিংস ঘটনায় ৪০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক প্রাণ হারায়। ধর্ষিত হয় অনেক মেয়ে। নয়া সরকার সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যত ব্যর্থ হয়। তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যান

সব ভালো যার শেষ ভালো

তারপরও বলা যায়, বিএনপি জোট সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী জাতিকে দেয়া তার কথা রাখতে চেষ্টা করছেন। ঘটনাটা প্রতিশ্রুতি পূরণের নয়, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।

সে দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচক বলা গেলেও কর্মকাণ্ডে তা ঘটছে না। দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে। অথচ নির্বাচনের পূর্বে তারা ভিন্ন কথা বলেছিলেন। জ্বালানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এ নিয়েই হরতাল করেছেন বেগম জিয়া মাত্র এক বছর আগেই। টাকার অবমূল্যায়নকে ছি ছি করেছেন। আর সেটাই নিজেরা করলেন সবচেয়ে আগে। সম্প্রতি শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে ফিরে এয়ারপোর্টে বলেছেন দেশে কি 'সামরিক আইন' চলছে? এ কথা থেকে বোঝা যায় দেশে একটা আইন বলবৎ আছে বা আইন বলবৎ করার চেষ্টা হচ্ছে। দুই নেত্রীকেই বুঝতে হবে ক্ষমতা দখল নয়, জনগণ ভোট দেয় দেশ একটি নির্ধারিত আইনের শাসন চলবে এই আশা নিয়ে। একজন নেত্রীকে দলের উর্ধে যেতে হবে দেশের মঙ্গলের জন্যে। খালেদা জিয়া তার কিছুটা আবাস দিয়েছেন ১০০ দিনের কার্যক্রমের মাধ্যমে।

প্রথম কথা দিয়েই শেষ করা যাক। 'হানিমুন'-এর অর্থ কার্যারম্ভের উৎসাহভরা সদিচ্ছার সময় হয়ে থাকে। বেগম জিয়ার একশ' দিনের শাসনে তার প্রকাশ ছিল, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটছে স্লথ ধারায়।